রবীন্দ্র-উপন্যাসের অর্থনীতি

ড. কৃষ্ণগোপাল রায়

অধ্যক্ষ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

চরিত্র আলম্বে অথবা আলম্ব হয়ে বৃত্ত-ভিত্তিক রচনায় আসে সমাজ; আর, সমাজ ও চরিত্রের সমায়োজনের ভিতর ক্রিয়াময় হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি।পাঠ-প্রক্রিয়ার সময় আমরা খেয়াল করি বা না করি, গল্প-উপন্যাস বা নাটকে অর্থনীতির রসায়ন থাকেই। এমনকি তখনও থাকে যখন উপস্থাপ্য থিমের অভিমুখ একেবারে ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো উপন্যাস লেখেননি যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ বা অর্থনৈতিক দিশাদর্শন। এর কারণ এই নয় যে ধনী পরিবারের সদস্য হিসাবে আর্থসমস্যার পীড়ন তিনি কখনো বোঝেন নি, বা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনীতির গুরুত্ব তিনি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। বস্তুত সত্য এর উল্টোটাই; ধনী পরিবারে জন্ম নিলেও মোটামুটি তিরিশ বছরের পর থেকে আজীবন তাঁর কেটেছে অর্থসমস্যার মধ্যেই। কিন্তু তাঁর কথাসাহিত্যে-বিশেষ করে উপন্যাসে সেই আর্থসমস্যার অভিজ্ঞতার সামান্য প্রতিফলনও ঘটেনি, এমন কি গ্রামীন অর্থনীতি যা নিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভেবেছেন মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে সারা অবশিষ্ট জীবন, তারও যথার্থ প্রতিফলন নেই তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পে।

'বউ ঠাকুরানীর হাট' কিম্বা 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতায় অর্থনীতি সংক্রান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত করার সুযোগ ছিল না একথা ঠিক, কিন্তু 'চোখের বালি' থেকে পরবর্তী উপন্যাসমূহ -- যাদের বিষয়বস্তু তাঁরই উদ্ভাবিত সেখানেও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত কোনো প্রধান চরিত্র বা ঘটনা নেই। থাকার কারণ ছিল কিন্তু যথেষ্টই। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্মিলিত ব্যাবসা 'টেগোর অ্যান্ড কোং' উঠে গেলে তার দেনা শোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করতে হয় মোতিচাঁদ নাখতারের কাছে ৭% সুদে। (ঋণ নেন ১৮৯৯ এর ২৫ আগস্ট। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ঋণ শোধ করতে পারেন না,বন্ধু প্রিয়নাথ সেন ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে নেন নাখতারকে অনুরোধ করে, কিন্তু সেই বর্ধিত মেয়াদেও পরিশোধ হচ্ছেনা ঋণ, অবশেষে বন্ধু তারকনাথ পালিতের কাছে ৭% সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়ে নাখতারের ঋণ শোধ করেন তিনি। এতে ঋণের পরিমাণ যায় বেড়ে। ঋণ-দায়ে এসময় এমনই জর্জরিত যে নিজের টাকায় বড় মেয়ে বেলার বিয়ে দিতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ; বরপণের দশ হাজার টাকা দান করেন দেবেন্দ্রনাথ।-বেলার বিয়ের মাস খানেকের মধ্যে (জুলাই,১৯০১) বিলাত থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত জগদীশচন্দ্র বসুর অসমাপ্ত গবেষনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য দুই লক্ষ টাকার ফান্ড তৈরীর অনুরোধ করে চিঠি দেন তাঁকে। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক আইকন হিসাবে বন্ধু জগদীশকে দেখতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ; তাই নিজের ব্যস্ততা ও আর্থিক সঙ্কটাবস্থা সত্ত্বেও ও একদিকে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর আবিস্কার বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন, অন্য দিকে তেমনি ঐ ফান্ড তৈরীর জন্য উঠে পড়ে লাগেন, ছুটে যান ত্রিপুরার মহারাজা মহাতাবচন্দ্র মানিক্যের কাছেও; এ সময় নিজের আর্থিক অসঙ্গতির কথা তাঁকে বার বার বলতে শোনা গেছে। এরই মধ্যে আকস্মিক ভাবে সম্পর্ক হয় রেণুকার বিয়ের; বেলার বিয়ের বাহান্ন দিন পর(আগস্ট ৬, ১৯০১) বিয়ে হয় রেণুকার, রবীন্দ্রনাথ খরচ করতে পারেন মাত্র পাঁচশো টাকা। বরপণের দাবী ছিল না, দাবী ছিল বিয়ের পর জামাইকে বিলেত পাঠানোর;বিয়ের অব্যবহিত পরেই সে ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। এছাড়া রেণুকার বিয়ের তিন মাস ষোলো দিন পর (২২ ডিসেম্বর/৭ পৌষ) মহর্ষির জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। স্বভাবতই এর আর্থিক দায়ও নিতে হয় তাঁকেই।

এইরকম আর্থিক অবস্থার মধ্যেই তিনি লিখেছেন 'চোখের বালি'। অন্য কোনো ঔপন্যাসিক হলে অসম্ভব ছিল না অর্থসমস্যা-তাড়িত বৃত্ত নির্মান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি; শুধু করেননি নয়, যে চরিত্রকে অর্থ-সঙ্কট তাড়িত করে দেখানোর অবকাশ ছিল, সেই বিনোদিনীকেও উপন্যাসে দেখা গেল অর্থ-সমস্যার প্রশ্নগুলো গুরুত্ব না দিয়ে পরিয়ে যেতে; উপন্যাসে সমস্যা তার অর্থ-কারণে নয়, মনোগহীনের বক্র-জটিল উজান-ভাটায়।

১৯০৩-এর এপ্রিল থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'। এখনও আর্থনৈতিক অবস্থা তাঁর কিছুমাত্র পাল্টায় নি। বিশাল টাকার ঋণ রয়েছে তারকনাথ পালিতের কাছে; আশ্রম পরিচালনায় ব্যয় হচ্ছে যথেষ্ট,কারণ একেবারে প্রথম পর্যায়ে আশ্রমিকদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হত না। আবার এ সময়েই মারা যান মৃণালিনী দেবী,আর তার অল্প কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে রেণুকা, চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী তাকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনে যেতে হয় আলমোড়ায়। সহজবোধ্য যে এ সময় বাড়তি অর্থচাপ নেমে আসে। এইরকম পরিস্থিতিতে টানা সোওয়া দু'বছর ধরে লেখা হচ্ছে 'নৌকাডুবি' যার বিষয়বস্তু বা চরিত্র সমাবেশে কোথাও অর্থ সঙ্কটের প্রভাব নেই।

'গোরা' লেখার সময়ও রবীন্দ্রনাথের অর্থাবস্থা পূর্বরূপ। উপরন্তু ঋণ শোধের তাগিদে নরেন্দ্রনন্দিনী দেবীর কাছে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন শতকরা সাড়ে ছয় টাকা সুদে, প্রিয়ংবদা দেবীর কাছে নিয়েছেন দশ হাজার টাকা। এর মধ্যে তাঁর নিজের অংশ পাঁচ হাজার টাকা। এই টাকা শোধ করেছেন তিনি কালীগ্রাম কৃষিব্যাঙ্কে গচ্ছিত চার হাজার টাকা তুলে এবং দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছে শতকরা নয় টাকা সুদে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে। এই টানাটানির মুখেই তিনি রামানন্দ বাবুর কাছে ধার করেছিলেন তিনশো টাকা এবং সেই টাকা শোধ দিতেই 'গোরা' লেখার সূচনা। স্মরণ্য যে 'গোরা'য় গোরার ভারত-দর্শন প্রসঙ্গে চরঘোষপুরের গরীব মুসলমানদের কথা বিন্যস্ত হয়েছে; গোরার পল্লীদর্শন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে কলকাতার নিকটস্থ নানা গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা তথা আচার-বিশ্বাসের ইতিকথা। শিলাইদহ – সাজাদপুর- পতিসর অঞ্চলে পল্লী উন্নয়নের কাজ করতে গ্রামীন জীবনের যে রূপ রবীন্দ্রনাথ নিজে দেখেছিলেন গোরার বীক্ষায় তারই উপস্থাপনা, কিন্তু লক্ষণীয় গোরার বীক্ষণে গ্রামীন ভারতবর্ষের অর্থসঙ্কট গুরুত্ব পায়নি, পেয়েছে তাদের কুসংস্কার, কু-প্রথা, অন্ধবিশ্বাস, পরনির্ভরতা, আত্মশক্তিবোধহীনতা ইত্যাদি। যে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ সমস্যায় জেরবার, কিম্বা গ্রামোন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে যিনি পল্লীবাসীর অর্থশক্তিকেই বিশেষভাবে দৃঢ় করতে চাইছেন- শেখাতে চাইছেন সমবায় প্রথায় চাষ, মাটির যথাসম্ভব উপযোগ-গ্রহণ, সবজি-চাষ, কৃষি-নির্ভর কুটিরশিল্প ইত্যাদি, উপন্যাস লেখার সময় সেসবের কিছুই বিষয় হিসাবে গ্রহণ করছেন না। এটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

১৯১৩ তে নোবেল পুরস্কার পেলেন; সমবায় ব্যাঙ্ক আগেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পুরস্কারের টাকা সেখানে জমা রেখে সুদের টাকায় শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্বাহের ব্যাবস্থা করে কিছুটা স্বস্তি এল, কিন্তু শান্তিনিকেতনের পঠন-পাঠন, ঘরবাড়ি নির্মান, নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে তা সুপ্রতুল নয়। তাই বিদেশে বক্তৃতা বেচে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় তাঁকে ক্রমান্বয়ে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে এ-সময়। এরই মাঝে লেখা হচ্ছে 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে-বাইরে'। 'চতুরঙ্গে' অর্থসঙ্কট যে-টুকু এল তার নিরাকরণ হল অত্যন্ত দ্রুত শ্রীবিলাস দামিনীকে বিয়ে করার পর কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিল এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের কৌলীন্যে সে-কাজ পেতে কোন সমস্যা হল না; সংসারে সচ্ছলতা আনতে আরও যে টাকার প্রয়োজন দেখা দিল,নোটবই ইত্যাদি লিখে অচিরাতে সেই সংকটও পেরিয়ে এল সে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভুবনে একজন যথার্থ গরীব প্রজার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল 'ঘরে-বাইরে'তে; সে পঞ্চু। দিনের বেলায় চাঙাড়িতে করে পান-দোক্তা, রঙিন সূতা,আয়না-চিরুনি এইসব নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে,রাতে বাতাসা কাটতে যায় বা শাঁখার কাজ করে। সারা দিন খেটে যা তার আয় তাতে মা-মরা ছেলে-মেয়েগুলোর সম্পূর্ণ আহার সে জোগার করতে পারে না। সে নিজে খেতে বসেই আগে এক ঘটি জল খেয়ে নেয় যাতে ভাত কম খেতে হয়।

অভাবের দায়ে নিখিলেশের খাসবাগান থেকে সে কয়েকটা নারকেল চুরি করেছিল, পরে পয়সা জুটিয়ে সেই নারকেল কিনে ফেরৎ দিতে এসেছে। অভাব স্বভাবকে বিচলিত করলেও তার সততাকে বিচলিত করতে পারেনি। সন্দীপের দল তার বিদেশি জিনিস কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চন্দ্রনাথ বাবু তাকে আবার ব্যবসার জন্য পুঁজি ধার দিয়েছেন। পাশের জমিদার হরিশ কুণ্ডুর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য, কিম্বা তার চরম বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্য চন্দ্রনাথ বাবু কী করেছেন তা ভুলে গিয়েছে পঞ্চু এই অভিমানে যে চন্দ্রনাথ বাবু তো ব্যবসার পুঁজিটা তাকে দান করতেই পারতেন। দান করলে যে তাকেই অপমান করা হত, তারই কর্মশক্তিকে শিথিল হতে সাহায্য করা হত, পঞ্চু তা বোঝেনি। জীবিকার্জনে সে পরিশ্রমী, কিন্তু হীনমন্যতায় সে ভোগে, অপরের সাহয্যে নিতে তার লজ্জা নাই। নিজেকে সম্মান করতে এবং নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখতে পারে না বলেই সে ঘুরেও দাঁড়াতে পারে না। বাংলার সমকালীন সকল দীন পল্লীবাসীর সবচেয়ে বড় সমস্যা এইটাই। পল্লী উন্নয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথ তাই ম্রিয়মান পল্লীবাসীর মনে আশা-স্বপ্ন-সাহস জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কর্ম-নিরপেক্ষ রূপে নয়; পরিশ্রম ও তার সুফল লাভের অভিজ্ঞতাতেই সেই আশা-স্বপ্ন-সাহস জেগে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেছেন। স্বভাবতই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষকে এইভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করানোর কথা যিনি ভাবেন, তিনি প্রচলিত অর্থনীতিবিদ্ নন, কিন্তু পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক পরিবর্তনের তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা। 'ঘরে বাইরে'তে তবু এ স্বপ্ন---এই উন্নয়নপ্রয়াস প্রধান গুরুত্ব পায়নি।পঞ্চুর স্থান উপন্যাসের মূল ঘটনা প্রবাহে অকিঞ্চিৎকর,- 'বাইরে'-র বিচিত্র জীবন-রূপের সে একজন। যাকে নিয়ে উপন্যাসের নায়কত্ব, তারও রয়েছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ। সে-সময়ে স্বদেশীদের বয়কট কার্যক্রমকে সে মানতে পারে নি। দামে শস্তা,টেকসই বিদেশী দ্রব্যকে বয়কট করার অর্থ দেশের গরীব মানুষের উপরেই অত্যাচার করা এতে তার সন্দেহ ছিল না; সে চেয়েছিল বিদেশী দ্রব্যের চেয়ে আরো শস্তা, আরো টেকসই স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন করতে এবং সেটা সম্ভব হলে যে আর জোট বেঁধে বিদেশী দ্রব্য বয়কট করার প্রয়োজনই হবে না, মানুষ তার নিজের আগ্রহেই যে স্বদেশীর দিকে ফিরে যাবে-এ ব্যাপারে সে ছিল নিশ্চিত। পরশক্তির সঙ্গে সংঘাতে বলক্ষয় নয়,আত্মশক্তি লাভের সাধনায় সবল হওয়াতেই যথার্থ চরিতার্থতা। যেমন দেশসেবায় তেমনি অর্থনীতিতেও-এই তার অভিমত। কিন্তু এই অভিমত ব্যক্ত করেই দায় নির্বাহ করে না নিখিলেশ, সে চেষ্টা করে দেশি কাঁচি, দেশি সাবান, দেশি কলম ইত্যাদি উৎপাদনের। সফল সে হতে পারেনি, লোকসানই হয়েছে বার বার,তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার চলেছেই। কিন্তু পঞ্চুদের জীবন-বৃত্ত যেমন উপন্যাসের বানী-বিন্যাসের মূল ক্ষেত্রে আসে নি, তেমনি নিখিলেশের অর্থনৈতিক আত্মশক্তি লাভের প্রয়াসও। তবু বোধ হয় একথা ঠিক যে এই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেই লেখকের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভাবনা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে, স্মরণ্য এই যে এ সময়টাতেই তাঁর ব্যক্তিজীবনে অর্থ-সমস্যা তুলনামূলক ভাবে কম, উদ্দীপনশক্তিই বেগশালী।

যখন 'যোগাযোগ' লিখছেন কিম্বা 'শেষের কবিতা' তখন আবার তাঁর অর্থ-সমস্যা তীব্র হয়েছে; বিশেষ করে শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতনের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে। লক্ষণীয়, এ সময়টায় বয়সও রবীন্দ্রনাথকে ধরে রাখতে পারছে না, ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন যে-সব তাড়নায়, অর্থ প্রয়োজন তাঁর অন্যতম। ভরতপুরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলেন তিনি ভরতপুরের মহারাজের আমন্ত্রণে,তাঁর মনে তখনও এই আশা ছিল 'বিশ্বভারতীর জন্য মহারাজের কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়' (দ্র. রবীন্দ্র জীবন-কথা/প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/আনন্দ/২০০৪/পৃ.১৩৬)। ১৯২৭(আষাঢ়, ১৩৩৪)এর জুন থেকে বেরিয়েছিল বিচিত্রা; এই পত্রিকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'তিনপুরুষ' উপন্যাস, পরে যার নাম পাল্টে রাখা হয় 'যোগাযোগ'। প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন 'আসলে বিচিত্রার জন্য ততটা নয় যতটা কবির নিজের জন্য অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজনে'।(ঐ/পৃ. ১৩৭) এই একই অর্থাবস্থার মধ্যেই তিনি রচনা করছেন 'শেষের কবিতা'; লেখা শেষ হচ্ছে ২৮ জুলাই, ১৯২৮ ।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন আরো তিনটি, মালঞ্চ(১৯৩৩), দুই বোন(১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪)। মোটামুটি একইরকম অর্থাবস্থার মধ্যেই এগুলোও লেখা। তবে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান এ সময়ে খুব সাহায্য করেছে তাঁকে। এলেমহার্স্ট বহু অর্থ ও শ্রম দান করেছেন শ্রীনিকেতনের কাজে, হাইদ্রাবাদের নিজাম ১৯৩৩-এ এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন ইসলামী সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্য;বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও গায়কোয়ার ১৯২৫ থেকে প্রতি বছর ছয় হাজার টাকা সাহায্য করেছেন,- এই রকম ধনী ব্যক্তিদের পাশাপাশি মোহিতচন্দ্র সেনের মতো স্বল্পবৃত্ত সাধারণ মানুষও মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। এ সব সাহায্যের পরও আরো প্রয়োজন ছিল অর্থের। তাই দেশে-বিদেশে অর্থের বিনিময়ে বক্তৃতা করে ও নাটক- গীতিনাটক পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে।

এই নাতিদীর্ঘ ইতিবৃত্ত স্মরণে রেখে রবীন্দ্র- উপন্যাসগুলির পর্যালোচনায় এগোলে স্বীকার করতে হবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে 'ঘরে বাইরে'-কে বাদ দিলে আর কোন উপন্যাসেই নিজের ভৌত অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগাননি। তাঁর কোনো উপন্যাসের নায়ক কবি বা কথাকার নয় (অমিত কবিতা লেখে,কিন্তু তার মৌল পরিচয় কবি নয়),গায়ক (বিপ্রদাসকে মনে রেখেই বলছি),অভিনেতা, নাট্যকার,সম্পাদক নয়, প্রাবন্ধিক নয়, শিল্পী নয়, পরিব্রাজক নয়, বিদ্যালয়ের সংগঠক বা শিক্ষক নয়,পল্লী উন্নয়নের কর্মীও নয়। অর্থাৎ, যারা নায়ক হলে তাদের সমস্যা-সংগ্রাম-যন্ত্রণা-উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার রসদ রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যেই পেয়ে যেতেন, পেতেন তাদের বাস্তব কর্ম-পরিসর অথবা বৃত্ত-বিষয়, তা তিনি পরিহার করেছেন। কিছুটা ব্যতিক্রম শুধু আগেই বলেছি 'ঘরে বাইরে'।

অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে তাঁর রচনার — বিশেষ করে কথা-সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেন; রবীন্দ্রনাথকে দেখছি তা করলেন না, যদিও ছোটগল্পের ধারায় নিখিলেশের মতো রবীন্দ্র-অভিজ্ঞতা-পুষ্ট কতিপয় চরিত্র পাবো। কিন্তু কেন এমন হল? কেন রবীন্দ্রনাথ নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন উপন্যাস লেখার সময় ? – কবি, শিল্পী, গায়ক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, বিদ্যালয় সংগঠক,শিক্ষক প্রভৃতি যে সব চরিত্র তিনি রূপায়িত করতে পারতেন নিজ-অভিজ্ঞতার উপাদানে, অভিজ্ঞতার সেই উপাদান ব্যয়িত হয়েছে মূলত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য আলোচনা বা প্রবন্ধ-রচনায় বা ভাষণ-অভিভাষণে। সে-সব লেখায় অভিজ্ঞতার তাড়নাই প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে প্রায় সকল ক্ষেত্রে। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সংগঠকের অভিজ্ঞতা তিনি বিন্যাস করেন নি কোন উপন্যাসে বা ছোটগল্পে, ঠিক যেমনভাবে চাষা-ভুষোদের, চাষের, সালিশি সভার, তার সদস্যদের, গ্রামোন্নয়ন কর্মের যারা কর্ণধার তাদের অভিজ্ঞতা কোনো কাজে লাগেনি তাঁর কোনো উপন্যাসেই।'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' প্রমুখ কবিতায় কিম্বা 'শাস্তি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি গল্পে 'নেই'(have not)-শ্রেণীর মানুষের কথা থাকলেও সে-কথা তাদের জীবন-জীবিকার বস্তুনিষ্ঠ চালচিত্র নয়। আপতিক ভাবে মনে হয় বটে উপেনের কাহিনি বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে/ তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'- এমন ভাবনা কি হতদরিদ্র অশিক্ষিত (সমকালীন পল্লীসমাজের বাস্তবতা তাই বলে) একজন চাষার মাথায় আসা স্বাভাবিক? উপেনের মা-বাবা বা সন্তান-কলত্র কেউ না-থাকার মধ্যে যে বাস্তবতা রোম্যান্টিকতায় ভেসে গেছে তা যদি গৌণ করেও দেখি, তবু স্বীকার করতেই হবে উপেনের কথা বানানো; বাস্তবে কোনো উপেন থাকতেই পারে না। যদি বাস্তব মডেল থাকতো উপেনের, তবে এ কবিতার গল্প অন্যরকম হত। একই ভাবে 'পুরাতন ভৃত্যে' কেষ্টার কিম্বা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে'র রাইচরণের জীবন-সংগ্রাম বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাদের নিখাদ প্রভুভক্তি বা দায়বদ্ধতার সকরুণ গল্প।'শাস্তি' গল্পটিও দারিদ্র্য- সংগ্রামে বা সামন্ত লাঞ্ছনায় দরিদ্র প্রজার প্রতিবাদী বা অবলুপ্তির কাহিনি নয়,শেষ পর্যন্ত চন্দরার রহস্যময় মনোগতির আখ্যান; যদিও সেই মনোগতি আসলে সিনিক প্রতিবাদ এবং তা মধ্যবিত্ত-ধর্মী। এই উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মাঝে-সাঝে বেছে নিয়েছেন নিচুতলার নিম্নবর্নের আবেষ্টন,

কিন্তু তাঁর নিজস্বতার মধ্যে বৃত্তের বিকাশ-পরিণতি বিলসিত না করে পিছলে এসেছেন মধ্যবিত্তের জগতে, অথবা এমন মহত্বের কথা শুনিয়েছেন যার জন্য ঐ আবেষ্টন অত্যাবশ্যক নয়।

কেউ লক্ষ্য করুন অথবা না-ই করুন, রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু লক্ষ্য করেছেন এই বিচলন, তাই এইসব কবিতা বা গল্প লেখার পরবর্তী পর্যায়ে নিচুতলার বা নিম্নবর্ণের মানুষ নিয়ে আর তিনি গল্প লিখতে যাননি, পরবর্তী-কালের কবিতা-ধারায়ও আসেনি আর কোনো উপেন বা কেষ্টা। প্রায় চল্লিশ বছর পর মৃত্যুর মাস খানেক আগে তিনি জানিয়েছেন নিজের সীমাবদ্ধতার কথা; 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার দিকে/ ভিতরে প্রবেশ করি সে-সাধ্য ছিল না'।

শৌখিন মজদুরি করে সাহিত্যের খ্যাতি অর্জন করবেন না- এই প্রত্যয়ে চিরশ্রদ্ধেয় রূপেই তিনি সৎ। তাঁর অভিজ্ঞতা, শিল্প প্রয়াস এবং প্রতীতি পর্যালোচনা করে জানা যাচ্ছে,অভিজ্ঞতার যে সম্বলে দিকদিশারী সন্দর্ভ রচনা করা যায়, শুধু সেইটুকু সম্বলে গল্প- উপন্যাস লেখা যায়না। তার জন্য চাই আরো ব্যাপকতা, অনুপুঙ্খের এমন অভিজ্ঞতা চাই যাতে গৃহীত বস্তুতে সর্বতোভাবে লীন হতে পারা যায় অনায়াসে।

যেখানে এমনই অনায়াস রবীন্দ্রনাথের বস্তু-আধৃতি, প্রসারিত ভাবে লীন হতে চেয়েছেন তিনি সেই আবহে। সেটা অর্ধসামাজিক দিক থেকে তাঁর নিজেরই জগৎ। কথাটা আরও স্পষ্ট হবে যদি লক্ষ্য করি তাঁর উপন্যাসের নায়কদের পেশা বা আর্থসংগতি। অবশ্যই এক্ষেত্রে তাঁর 'বউ ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষির প্রাসঙ্গিকতা নেই, কারণ তারা ঐতিহাসিক, সেখানে রাজা-গজাদের ইকোনমিক্স। আমরা দেখব বাকিগুলোকে- 'চোখের বালি'-র নায়ক মহেন্দ্র, কারো কারো মতে বিহারী, যে-ই হোক, দুজনেরই আয়ের উৎস ভূসম্পত্তি, কলকাতায় দুজনেরই বড় বাড়ি, মহেন্দ্রর বাগান বাড়ি রয়েছে দমদমে, বিহারী পরে বালিতে গঙ্গার ধারে বাড়ি কিনেছে এবং তার জন্য তাকে একটুও ভাবতে হয়নি। তারা ডাক্তারি পড়ে আদৌ অর্থের জন্য নয়।-'নৌকাডুবি'র রমেশের পিতা ব্রজমোহনের সম্পত্তি এতটাই যে তাঁর মৃত্যুর পর বিষয়-ব্যবস্থা করতে রমেশের তিন মাস সময় লেগে গেছে। উপার্জনের জন্য তাকেও ভাবতে হয়নি। অন্যদিকে,নলিনাক্ষের পিতা ফরিদপুরে 'ছোটখাটো জমিদার' ছিলেন; মাকে নিয়ে নলিনাক্ষ কাশীতে থাকত, সে প্রথিতযশা ডাক্তার।- 'গোরা' উপন্যাসে গোরার পালক-পিতা কৃষ্ণদয়াল কমিসরিয়টের চাকুরি থেকে 'রাশ রাশ টাকা' নিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন,পেনসন পান; জায়গির আছে বছরে যার আয় কম করেও হাজার টাকা। গোরার বন্ধু বিনয়েরও অর্থের উৎস ভূসম্পত্তি। অভিভাবক নাই, দায়দায়িত্বও নাই, আছে অবারিত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাই গোরা বা বিনয়কে একটিবারও ভাবতে দেখা যাচ্ছে না। পরবর্তীকালের বাঙালি যুবকেরা প্রেমে পড়েই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভেবে ভেবে প্রজাপতির ঠিকানা ভুলতে বসেছে, অথবা সেটাই হয়েছে তাদের ট্র্যাজেডির কারণ। গোরা বা বিনয় এদের কেউ নয়,তারা দেশকর্মে ব্রতী হয়,প্রেমে পড়ে,বিয়ে করে, অর্থোপার্জনের প্রশ্ন আদৌ জরুরি নয় তাদের কাছে, কারণ সে নিরাপত্তা তারা পেয়েই আছে সামন্ত-কৌলিন্যে।রবীন্দ্রনাথের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা তো এমনই। কবিতা লেখা, গান করা, দেশব্রতে অংশগ্রহণ করা বা তদনুরূপ যে-কোনো ইচ্ছা মতো কাজ করতে কোথাও বাধা নেই তাঁর, প্রথাগত পড়াশুনা না করলেও কোনো কাজ থেমে থাকে না, বিয়েও না, বিয়ের পড়ে বৌয়ের লরেটোর শিক্ষাও না। আর্থসামাজিক যে আবেষ্টনের ভিতর জীবনকে দেখেছেন তিনি, তাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।তাঁর যে অভাব, ঋণ বা আর্থিক টানাটানির কথা আমরা বলেছি বা তথ্য হিসাবে হাজির করেছি,এখানে স্মরণ্য, তা আদৌ তাঁর রুজি-রোজগারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; তার জন্য তাঁর বা তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভরণ-পোষণের কোনো সমস্যা হয়নি;অন্ন-বস্ত্রের ও অন্যান্য যাবতীয় আবশ্যকতা-পূরণের বাইরের ব্যাপার তা। সেই জন্যই যে অর্থ-সংকট রুজি-রোজগার সংক্রান্ত, যা মধ্যবিত্ত যুবককে উদভ্রান্ত করে ফেলে, প্রেম এবং অন্যান্য সাধ-স্বপ্ন বা আদর্শকে শীতজীর্ন পল্লবের ন্যায় করে ধুল্যবলুণ্ঠিত, তার বস্তুনিষ্ঠ চালচিত্র এইসব উপন্যাসে পাওয়া গেল না।

পাওয়া গেলনা 'চতুরঙ্গেও'। ননিবালাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শচীশকে ভাবতে হয়নি বৌকে সে কি খাওয়াবে, কিভাবে পালন করবে ননিবালার গর্ভস্থ শিশু।সে-সব দায় যেন জ্যাঠামশায়ের। জ্যাঠামশায়ের কিনা, তাও ভাবছে না শচীশ; সে জানে শুধু কাজটা করতে হবে। আসলে এটাই রবীন্দ্রনাথেরও দেখার দিক; অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে তিনি ভাবেনই না। শচীশের না হয় জ্যাঠামশায় ছিলেন,কিন্তু শ্রীবিলাসের? সে যখনই ভাবল দামিনীকে বিয়ে করতে হবে, অমনি সে-কাজে এগিয়ে এল;অর্থের সংগতি তার একেবারেই নেই, সে বিনয় কিম্বা বিহারী নয়, একেবারেই ভূ-সম্পত্তিহীন, ভদ্রাসনহীন বেকার যুবক। তবু বিয়েটা সে করেই ফেলল। অর্থনীতির এই বিপাকটা রবীন্দ্রনাথ উত্তরণ করেছেন শ্রীবিলাসের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ তকমা দিয়ে; অনায়াসে সে একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে, উপার্জন বাড়িয়েছে নোটবই লিখে।

এই বছরেই প্রকাশিত অন্য উপন্যাসটির নায়ক নিখিলেশও জমিদার। সততই অর্থনৈতিক কোন সমস্যা নেই তার, সমস্যা যার থাকতে পারত সে তার বন্ধু দেশকর্মী সন্দীপ। না স্থাবর, না অস্থাবর সম্পত্তি আছে সন্দীপের। নিখিলেশের সহপাঠী হিসাবে ধরে নেওয়া যায় সন্দীপও এম.এ পাস। ইচ্ছে করলেই শ্রীবিলাসের মতো সেও কোনো একটি চাকুরি জুটিয়ে নিতে পারত।কিন্তু তেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভাবনা আদৌ ছিলনা সন্দীপের, দেশব্রতে সে জীবন উৎসর্গ করেছে। ভরণ-পোষণের দায় দেশের, অর্থাৎ তা চলবে সাধারণ মানুষের চাঁদায়। দেশব্রতী হয়েও সে ভাবে "আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার আনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে; এটা আর যাই হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না" — সন্দীপের এ ভাবনা কি তার অর্থ-সমস্যার অভিব্যক্তি? আদৌ নয়, এ অভিব্যক্তি তার অবদমিত লালসার। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেও অন্তর্গত লালসা সে জয় করতে পারেনি।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নিয়ন্ত্রণ আছে অর্থনীতির ভাঙাগড়ায়। নিজে সামন্ত-সন্তান রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন সামন্ততন্ত্রের ভবিতব্য।ব্যক্তিগত জীবনে এই আবেষ্টন থেকে বেরিয়েও আসতে চেয়েছিলেন তিনি এবং নানা কারণে তা পেরে না- উঠেও অন্তত বীতস্পৃহ হয়েছিলেন জমিদারিতে। কুমু ও বিপ্রদাসের বাবা যেভাবে ভোগ করেছিলেন সামন্তজীবন, বিপ্রদাস তা পারেনি। আকস্মিক আয়ের প্রয়োজন—তা বেহিসাবী বেদরদী ভাইয়ের কারণে হলেও, বিপ্রদাস মেটাতে পারেনি জমিদারির আয় থেকে। বারবার তাকে ঋণ করতে হয়েছে এবং অবমাননা তার,এবং কুমুরও, অনিবার্য হয়েছে; তাকে হাত পাততে হয়েছে মধুসূদনেরই কাছে। মধুসূদনের পূর্বপুরুষ ছিল জমিদার; বিপ্রদাসেরই পূর্বপুরুষের সাথে মামলা লড়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছিল। মধুসূদনের বাবা ছিল মুহুরি; মধুসূদন অল্প বয়স থেকে ব্যবসায় মন দিয়েছে এবং ঔপনিবেশিক পরিসরের ভিতর ও তার অবকাশগুলি যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করে নিজেকে ক্রমে সমৃদ্ধ করেছে ধনে। তবু নিখাদ পুঁজিপতি সে একান্তই; প্রভূত ধনার্জনের পরেও আরো ধন, আরো ঐশ্বর্যের লোভ তার কমেনি। ধনতৃষ্ণা তার অদম্য, অর্জিত ধনগৌরবে অহংকৃতও সে চূড়ান্ত। পতিতাবস্থা বিপ্রদাসকে ঋণ দিয়ে তাই সে তার জন্মের বহু আগেকার চাটুজ্জে-ঘোষাল বিরোধের প্রতিশোধ নিতে চায়। ঋণ দানের এই সূত্রেই কুমুদিনীর বিয়ে হল প্রৌঢ়-প্রায় মধুসূদনের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন কিভাবে ধনতন্ত্র শুষে নেয় সামন্ত গরিমার শ্রী ও সম্ভ্রম, এবং শুষে নিয়েই ক্ষান্ত হয়না, রূঢ় নির্দয়তায় ধুল্যবলুণ্ঠিত করতে চায় তাকে। এ উপন্যাসের অন্তিমে মধুসূদনের গৃহে কুমুর ফিরে যাওয়া যথার্থ হয়েছে কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক উঠেছে সমালোচক মহলে (দ্র. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিম্বা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-সমূহ), কিন্তু অর্থনীতির নিয়মে কুমুকে ফিরে যেতেই হবে মধুসূদনের কাছে। কারণ, সামন্ত অর্থনীতি অবলুপ্ত হবেই ধনতন্ত্রের ভিতর। সামন্ত সংস্কৃতির কুমুদিনী-মধু সূদন করবেই ধনতন্ত্রের আগ্রাস। অর্থনীতির এই অনিবার্যতা অস্বীকার করা যায় না জেনেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসকে নিয়ে গেছেন এই পরিণতিতে। অর্থনীতির বৈবর্তনিক টানে সমাজ তথা মানব জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এ

উপন্যাসের সত্য সেই কথা বলেছে। কিন্তু অর্থনীতির এই গূঢ় তত্ত্ব মানবিক সংবেদনার এমনই গভীর অবতলে ক্রিয়াময়, বিপ্রদাসের আদর্শলোক কিম্বা কুমুর মানস-সংকট এমনই বর্ণাঢ্য যে সামন্ত অর্থনীতির নাভিশ্বাস-চিহ্নগুলোকে আমরা সতত অর্থনীতির নিয়মে বুঝে নিতে ভুলে যাই। পঙ্গুর সমস্যাই সমস্যা, বিপ্রদাসের সমস্যা সমস্যা নয়, তা কিন্তু নয়; তবে এই দুজনকে পাশাপাশি স্মরণে রাখলে বোঝা যাবে সামন্ততন্ত্র কিভাবে নিচুস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে; দরিদ্রকে রক্ষায় কি ভূমিকা নেয় এবং কিভাবে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।সামন্ত-অর্থনীতির এই পূর্নায়ত রূপটা রবীন্দ্রনাথ চিনতেন,দেখেছি হাতের তালুর মতো স্পষ্ট করে। উপন্যাসে তার রূপ ফোটাতে তাই তিনি এত অনায়াস।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইখানে লক্ষ্য করার; শিল্পযুগে সামন্ততন্ত্রের নীরক্ত হয়ে যাওয়াকে এই যে রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাসের মধ্যে শনাক্ত করলেন, এরপর তাঁর আর কোন উপন্যাসে ভূমিজ অর্থাশ্রয়ী নায়ক এল না। ব্যতিক্রম শুধু 'চার অধ্যায়ে'র অতীন্দ্র। তাও অতীন্দ্রকে যখন দেখছি তখন তাঁর অর্থনীতিগত কোনো অবস্থানই নাই; সামন্তীয়ানা তার অতীত। এবং সেই অতীতেও তাঁর জমিদারী ভরে উঠেছিল ঋনের গর্তে। ঘটনাধারায় অতীন্দ্রের সামন্তী উত্তরাধিকার শুধু একটি ঘড়ি, খান দুই তুলে রাখা জামা, আর তার চেহারা। এখন তার খাওয়া-থাকার ব্যাবস্থা করে দল। স্বভাবতই অর্থনীতির টানাপোড়েন বা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখানে নিরর্থ, যদিও দলের অর্থশক্তি অনুযায়ী চলে তার যাপনিকতা। তার বহুছিন্ন জামা দলের অর্থশক্তি চেনায়।

'যোগাযোগ' লেখা শেষ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেছিলেন 'শেষের কবিতা'। অর্থনীতির দিক থেকে এ উপন্যাস মূলত উচ্চবিত্ত সমাজের কাহিনি। নায়ক অমিতর জন্য তার বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যা অধস্তন তিনি পুরুষের অধঃপাতে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তেমনি অর্থবান কেটি বা তার দাদা নরেন মিত্তির। যোগমায়া যতিশংকরেরাও ধনবান। এ উপন্যাসে নিম্নবিত্ত শুধু একজনই- শোভনলাল। কলেজে পড়ার সময় সে বই কিনতে পারে নি; দারিদ্র্যের অসহায়তা তার মনকে করেছে ভীরু, যে-মেয়ে প্রতিদিন অপেক্ষা করেছে তার, মনে মনে সেও যাকে ভালোবেসেছে, তাকে বলতেই পারেনি তার কাছে কি সে চায়। ভীরুতার উৎস তার দারিদ্র্য। অন্যদিকে নায়িকা লাবণ্য মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বাবা অবিনাশ পশ্চিমের কলেজের অধ্যক্ষ। স্বয়ংভর জীবনযাপনের লক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে যোগমায়ার বাড়িতে তাঁর মেয়ের গভর্নেসের কাজ নিয়েছিল লাবণ্য। শোভনলাল তাঁর মেধার জোরে পেয়েছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি। সাফল্য তাকে সাহসে এনেছে, যে-সাহসে সে লাবণ্যকে পত্র-মাধ্যমে জানতে চেয়েছে একদা যে র্ভৎসনা তাকে সইতে হয়েছে তার কারণ কি। দারিদ্র্য কেটে গেছে শোভনলালের নিজেরই সাধনার পথে, কিন্তু যে ভীরুতা তার জীবনে এনেছিল গভীরতম বেদনা তার উৎস যে তার অর্থদীনতা, অর্থাৎ অর্থদীনতা যে পৌরুষের সহজ প্রকাশের পক্ষে বাধা — ভীরুতার অন্যতম উৎস- এই সত্যটিকে পাওয়া যাচ্ছে এ উপন্যাসে।

১৩৩৯-এ বিচিত্রায় ছাপা হল 'দুই বোন'। এ উপন্যাসের অর্থনীতি উচ্চস্তরীয়। নায়ক শশাঙ্কমৌলি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়র; পরে মথুর দাদার কনট্রাকটারি ব্যবসায় শরিকিয়ানায়ও যথেষ্ট তার উপার্জন। নিজের ভুলে শশাঙ্কর জীবন এবং অর্থনীতিতে এসেছে জোয়ার-ভাটা, কিন্তু ভাটায় শেষ হয়নি এ উপন্যাস, উভয়ত অভিজ্ঞ সতর্ক অভিযোজনায় সার্থকতার দ্যোতনায় এর পরিণতি।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের নায়ক আদিত্য পুষ্প-বণিক। নিকষিত পরিচর্যায় মালঞ্চে যে বহুবিধ কুসুম- কর্ষণ, কলকাতার অফিস থেকে তারই বাণিজ্য। ধারের পুঁজি নিয়ে আদিত্যর এ বাণিজ্যের শুরু; তারপর সব ঋণ শোধ করে আজ সে প্রতিষ্ঠিত স্ব-মহিমায়। বৃত্তপরিধিতে যতদূর দেখা গেছে আদিত্যর কোনো অর্থ সমস্যা নেই।সরলার অর্থ-নিরাপত্তা বস্তুত নেই, কিন্তু আদিত্য ব্যবসা শুরু করেছে তারই জ্যাঠামশায়ের পুঁজি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে, তাঁরই কাছে নিয়েছে শিক্ষা; তাছাড়া সরলাও মালঞ্চের আরেক মালিনী। আদিত্যকে তাই ভাবতে হয়েছে সে সরলাকে আশ্রয় দিয়েছে, নাকি সরলাই দিয়েছে তাকে। তারপর একদা আবিষ্কারে সে তো পেল অন্য অধিকার। তাই এ আশ্রয়হীনা অর্থহীনাকে

অর্থসমস্যার মোচড়ে পড়তে হয়নি, যদিও আশ্রয়হীনা হিসাবে স্বদেশীর পথে জেলের আশ্রয় বেছে নেওয়া ছাড়া একদা সে আর কোন উপায় পায়নি, কিন্তু তখনও অর্থসঙ্কটের কথা তার মনে আসেনি।

'বউ ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' বাদ দিয়ে ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ —এই বত্রিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে নিখেছেন মোট দশটি; এর মধ্যে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি','গোরা', 'ঘরে-বাইরে','যোগাযোগ' এবং 'দুই বোন' এই ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন উপন্যাসের বস্তুনিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিয়ে, বাকি চারটি অর্থাৎ 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বস্তুকে লঘু করে ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মানে অবশ্য এই নয় যে এগুলোয় কাব্য প্রাধান্য পেয়েছে, এও নয় যে উপন্যাসের আঙ্গিক ছাড়া অন্য কোনো শিল্পাঙ্গিকে এগুলো লেখা যেত, হয়তো এগুলোতেই তিনি উপন্যাসের ভিন্ন অবয়ব ও অন্তর্শিল্পের সেই সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু সেখানেও- সেই বস্তু-লঘুতার আয়োজনেও অর্থনীতির স্বাভাবিক অন্তরস্থতা আমরা লক্ষ্য করেছি; লক্ষ্য করেছি সামন্ত-অর্থনীতির ক্রমবিবর্ণতা এবং ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র ('যোগাযোগ'-এ বিশেষভাবে লক্ষণীয়) ও তার উপজাত পেশা-সমূহের (শেষের কবিতা, মালঞ্চ, দুইবোন-এ যার কয়েকটি রূপ দেখা যাচ্ছে) মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত অর্থনীতির বিবর্তনের ধারাটিকে সঠিক ভাবে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস দশটিতে। কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁর কোনো উপন্যাসের গতি-পরিণতিই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত নয়- এমন কি 'ঘরে বাইরে' বা 'যোগাযোগ'-ও না। যে সমস্ত থিম নিয়ে তিনি উপন্যাসের বৃত্তবুনন করেছেন তার জন্য দরকার ছিল অর্থনীতির চাপ-মুক্ত পরিস্থিতি এবং সেটা আসলে সম্ভব অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর। সেই জন্যই তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রায় কেউই অর্থনৈতিক দিক থেকে 'সর্বহারা' শ্রেণীর নয়। যে দু-একজন বস্তুত সর্বহারা, কাহিনিতে তার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা অবস্নান হয়ে গেছে। নিজের মধ্য দিয়ে অথবা কল্পনায় তিনি যাদের সৃজন করতে পেরেছেন তারাই তাঁর উপন্যাস- বিশ্বের প্রধান কুশীলব, অভিজ্ঞতায় যাদের পেয়েছেন- পঞ্চু, মিরজান বা হলা মালী- তারা রয়েছে মূল-বৃত্তের বাইরে। শ্রীবিলাস- শোভনলালের মতো শিক্ষার দৌলাতে যাদের দেখা গেল যথা সময়ে সংকটজয়ী, রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাদের ভিন্নদশা হয়নি।